আমাদের শিক্ষা এবং মূল্যবোধ

❑ ড° অমলেন্দু চক্রবর্তী
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

একদিন ভারতবর্ষে তপোবনে যে শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল তার মূল উদ্দেশ্য সাফল্যলাভের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণতা, আর এই পূর্ণতার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল তপস্যার মধ্য দিয়ে। তাই সেদিন 'তপোবন', 'তপস্যা', 'শিক্ষা', 'পূর্ণতা' ইত্যাদি শব্দ এসেছিল ওতপ্রোত সম্পর্কে একের পর এক অন্বিত হয়ে। সাফল্যকে উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি বলেই সেদিন শিক্ষান্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে অভিজ্ঞান পত্রের (Certificate) কোনো সম্পর্ক ছিল না; গুরুর দিক থেকে শিষ্যের ওপর বর্ষিত হয়েছিল আশীর্বাদ আর প্রণত শিষ্য নিবেদন করেছিল গুরুদক্ষিণা। এই জ্ঞানযজ্ঞের দক্ষিণা ছিল তপস্যা, দান, সরলতা অহিংসা ও সত্যবাদিতা – "অযত্তপো দানমার্জবহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ (ছান্দোগ্য উপ. ৩/১৭/৪-৬)। অপরদিকে অভিজ্ঞানের ওপর ছিল ভারতীয় মনীষীর এক চিরন্তন অভিশাপ। শকুন্তলা কাহিনিতে তারই আভাস ব্যঞ্জিত হয়েছে কৌশলে। শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্তের প্রেম ছিল অভিজ্ঞান-নির্ভর, রাজপ্রদত্ত একটি আংটিই ছিল এই অভিজ্ঞানের ভূমিকায়। কাহিনির অগ্রগতিতে লক্ষ করি এই অভিজ্ঞান নদীগর্ভে মাছের পেটে আশ্রয় নিল, তখন প্রেম প্রমাণিত হল মিথ্যা বলে। অভিজ্ঞানের অসারতা সেদিনই প্রমাণিত হয়েছে।

সেজন্যই পূর্ণতার লক্ষ্যে আন্তরসত্তার – 'হয়ে ওঠা'র পথে অভিজ্ঞানের যেমন কোনো ভূমিকা ছিল না, তেমনি ছিল না প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবের কোনো স্পর্শ। কিন্তু পাশ্চাত্যের অভিঘাতে যখন আমাদের প্রাচীন শিক্ষাদর্শ বিলুপ্ত প্রায়, তখন বর্তমান শিক্ষার সঙ্গে জড়িত হয়েছে কিছু নতুন ভাবনা, সেগুলো হল, 'চাই সাফল্য' চাই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রবর্তী ভূমিকা, চাই ভৌতিক জগতে একাধিপত্য ও ভোগের অনন্ত অধিকার।' ফলে সাফল্যের মোহে আমরা হারিয়েছি পূর্ণতার সমাহিত সাত্ত্বিক নীরবতাকে, আমন্ত্রণ জানিয়েছি কোলাহলমুখর মানসিক অস্থিরতাকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদগ্র কামনায় আমরা অনিশ্চিত লক্ষ্যে নিরুদ্ধশ্বাস ধাবমানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি, ফলে জীবনে গতি এলেও গন্তব্য হারিয়ে গেছে এক অনির্দেশ্য ধূসরতার মধ্যে। ভৌতিক জগতে আধিপত্য স্থাপনের তথা প্রাকৃত সুখের অনুরক্তিতে আত্মাকে উপবাসী রাখার ফলে আমরা শুনতে পাচ্ছি অন্তরাত্মার অসহ্য কাতর কান্না 'ম্যায় ভুখা হুঁ।' এই কান্নার ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য সমাজে সৃষ্টি হয়েছে সীমাহীন উদাসীনতার, জন্ম দিয়েছে হিপি বিটনিক সমাজকে। তাদের জীবন যাপন, টি. এস. এলিয়টের ভাষায় 'partli living'। এই সমাজেরই নির্মম রূপ চিত্রিত হতে দেখেছি আমরা অ্যালবিয়র কামুর 'Outsider' উপন্যাসে। মায়ের মৃত্যুর পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের উত্তরে উপন্যাসের নায়ক উত্তর দিয়েছে—

"Mother died today. Or may be yesterday. I can't be sure" এই ক্লান্তি আর উদাসীনতাই হচ্ছে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার অবার্থ পরিণতি।

এই উদাসীনতার একটি নির্মম চিত্র আমি তুলে ধরতে চাইছি জার্মান নাট্যকার বোরশার্ট এর 'At the Front Door' নাটক থেকে। "তুমি কোথায়? তুমি তো সবসময় এখানেই ছিলে। কিছু প্রশ্ন করলে তার উত্তরে বলেছিলে, 'দেখো, আমি এখানেই আছি।' এখন কোথায় তুমি ? কোনো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন ? কোথায় গেল সেই ছোটোখাটো বৃদ্ধটি, যার নাম ভগবান? সবাই চুপ করে রয়েছ কেন, কোনো কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? কেন ?"

এই নাট্যকারই আধুনিক প্রজন্মের জীবনযন্ত্রণাকে ভাষা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন—

"We are the generation without ties, without any horizon.
Our horizon is an abyss. we are the generation without happiness.
Without a mother country, without farewell .... Our Sun is meagre,
Our loves are cruel and our youth
has no youth.
Now we can cry, we can sing
Whenever we want."

১৮৫৭ সাল থেকে ভারতবর্ষও ওই পথেই হাঁটছে। ওই বৎসরই কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু কলেজ' । শিক্ষাজগতে এই নতুনতর পদক্ষেপ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "নবযুগে বাংলার Tragedy হল এই যে এদেশের হিন্দুরা যে শিক্ষায়তন থেকে পাশ্চাত্য বিদ্যা আয়ত্ত করে যুক্তিবাদী কুসংস্কারমুক্ত ও উদারমতাবলম্বী হয়ে ওঠেন বলে দাবি করেন, সেই বিদ্যালয় কিন্তু সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।" মন্তব্যটি অবশ্যই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পাশ্চাত্যের আংশিকতাদুষ্ট শিক্ষার প্রভাব ভারতের শিক্ষা সমগ্রের বোধকে হারিয়েছে। তাই "সং গচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম"— ঋষি মধুচ্ছন্দার এই মন্ত্রটি আজ আমাদের চেতনার এক অপস্রিয়মাণ জগতের দূরাগত ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ২০০৪-এর ২৬ ডিসেম্বরে সুনামির নিষ্ঠুর অঙ্গুলিহেলনে দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে ভারতের এক প্রান্ত যখন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন, যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন, ক্ষুৎপীড়িত, তখন ভারতেরই পূর্বপ্রান্তে শীতের স্নিগ্ধ সকালে কাজিরাঙায় লোক সমাগম হয়েছে সবচেয়ে বেশি। অ্যাংলো নববর্ষে প্রথম দিনে চড়ুইভাতির বাঁধভাঙা উল্লাস পীড়িত করেছে সহানুভূতিশীল অঙ্গুলিমেয় ব্যক্তিসত্তাকে। এই নির্বিকার চেতনার প্রতিষেধক আজকের শিক্ষাব্যবস্থার হাতে নেই। শিক্ষাজগৎ থেকে সমস্ত মূল্যবোধ আজ বিসর্জিত। এই বিচ্ছিন্নতাজাত নির্বেদের ছবি ভাষা পেয়েছে জীবনানন্দ দাশের কবিতাতে—

"যদিও পথ আছে—তবু কোলাহলে শূন্য আলিঙ্গনে
নায়ক সাধক রাষ্ট্রসমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে;
প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো
কী এক বিরাট অবক্ষয়ে মানব সাগরে।"

আধুনিক জগতে এই দ্বৈপায়নী মানসিকতার জন্মদাতা অন্তঃসারশূন্য মূল্যবোধহীন শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কীভাবে অর্থকরী ঔদরিক বিদ্যার দিকে ঠেলেছে তা লক্ষ্য করা যায় অসমের বা আমাদের দেশের যে-কোনো প্রান্তের মাধ্যমিকের ফল বেরোবার পর। প্রথমদিকের স্থানাধিকারীদের যখন তাদের জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তখন প্রযুক্তিবিদ (Engineer) অথবা চিকিৎসক (Doctor) হওয়ার লক্ষ্য ছাড়া উত্তরে আর কিছুই শোনা যায় না। চিকিৎসক হওয়ার পিছনেও রয়েছে জনসেবার পরিবর্তে অর্থ-উপার্জনের নির্লজ্জ বাসনা। সমাজ-বিবিক্ত এই আত্মকেন্দ্রিক দ্বৈপায়নী মানসিকতার ফলশ্রুতিতে আসছে চরম আন্তর-অশান্তি। অভিভাবকদের মানস-অস্থিরতা প্রভাবিত করছে সন্তানদেরও। পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলেই সমগ্র সমাজের একটি চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠবে।

শিক্ষকদের নিষ্ঠাও আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। অথচ ভারতবর্ষের আচার্যরা একদিন ছিলেন একাধারে এতগুলি প্রাণের শাস্তা পিতা আর ধাত্রী মাতার মতো। এঁরা নিঃশেষে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছেন। যারা তাঁদের পেয়েছিল তারা অন্তরে ধ্রুব সম্পদরূপেই তাঁদের পেয়েছিল। ক্ষমাস্নিগ্ধ সকরুণ ভালোবাসার সম্মোহন মন্ত্রে এঁরা দেশের আত্মাকে সুপ্তি থেকে জাগিয়েছিলেন।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন দু'একজন ব্যতীত কারও মোটরগাড়ি ছিল না তখনকার ধীর গতির জীবনে, কিন্তু শ্রেণি বসত যথাসময়ে। সেদিনের শিক্ষকদের হাতেও অফুরন্ত সময়, পাণ্ডিত্যও ছিল অসাধারণ। আর আজ যখন লক্ষ্মীর অকৃপণদানে ভরে উঠেছে আমাদের অঞ্জলি, ঘরে ঘরে হয়েছে মোটরগাড়ি, তখন আমাদের ব্যস্ততা বেড়েছে মাত্রাহীনভাবে, আমাদের নিষ্ঠার ঝুলিতে পড়েছে টান, শ্রেণি শুরু হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে। এ-ছবি আজ দেশের সর্বত্র।

এর কারণ, প্রাকৃত জগতে আমাদের অধিকার যতই বিস্তৃত হয়েছে ততই অন্তর্জগৎ হয়েছে নিঃস্ব, মূল্যবোধের উৎস গেছে শুকিয়ে। আজ আমাদের দেশ যেমন প্রকৃতির উপাসনায় নিরত থেকে প্রাকৃত জগতে মাণ্ডুক্য-উল্লম্ফনে সর্বনাশের পারে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক তেমনি একদিন সে জগৎকে মিথ্যা অলীক বলে হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় ইহবিমুখ হয়ে শূন্যমার্গে উড্ডীন হয়েছিল—এই পৃথিবীতে তার বসার ঠাঁই ছিল না। দু'দলই ভ্রান্ত। তাই উপনিষদ স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, 'যাঁরা প্রকৃতির উপাসনায় নিরত তাঁরা 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি' ; আর যাঁরা সেই নির্বিশেষ 'এক'-এর উপাসনায় ইহবিমুখ, তাঁরা 'ততঃ ভূয়ঃ ইব প্রবিশন্তি।' এই দুয়ের কোনোটিকেই অস্বীকার নয়, এই

দুইয়ের যুগনদ্ধতার মধ্যেই রয়েছে জীবনের সার্থকতা। একদিকে শাশ্বত এবং অনন্ত , অপরদিকে ক্ষণস্থায়ী অথচ অব্যাহত এই সান্তকে মিলিয়ে ধরা— এই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। আমাদের উপকরণের জগৎ এবং অমৃতত্বের জগৎ—একদিকে আমাদের কাত্যায়নীবৃত্তি এবং অপরদিকে আমাদের মৈত্রেয়ী বৃত্তি—এই দুইকে না-মেলাতে পারলে জীবন ব্যর্থ হতে বাধ্য। চাই সংস্কৃতি এবং সভ্যতার হর-পার্বতী-অন্বয়। একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনার ইতি টানছি । "সংস্কৃতিহীন সভ্যতা মুণ্ডহীন অলংকৃত কবন্ধের মতো বীভৎস, তার মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই। আর সভ্যতাহীন সংস্কৃতি নীড়হারা পাখির মতো শূন্যে উড্ডীন - কোথায় তার পা রাখার জায়গা ? ... সে সংস্কৃতি আকাশ কুসুমের মতো অন্তরীক্ষে ভাসমান, সে ফুটবে কোথায় ?"

ওই আকাশকুসুমকে যদি এই পৃথিবীর ধুলো-জল-পাঁক-মাটিতে ফোটানো যায়, ওই আকাশের সোনার হাঁসটি যদি সেই পদ্মবনে বাসা বাঁধে, স্বর্গমর্ত্য যদি একাকার হয়ে যায়, 'দিব্যবসু' স্বর্গের ধন আর 'পার্থিববসু' মর্ত্যের ধন যদি মিলে মিশে যায়, তাহলেই, একমাত্র তাহলেই, সভ্যতার অতৃপ্তি আর সংস্কৃতির অপূর্ণতার বেদনা ঘোচে।" (গৌরী ধর্মপাল— 'বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ')।

শিক্ষাতেও এই দুই 'বসু'-র মিলনই আমাদের হৃত মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে সমর্থ হবে। শিক্ষায় আজ আমরা চাই প্রাকৃত জগতে অধিকার স্থাপনের ছাড়পত্র, তেমনি অন্তর্জগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ধ্যানগম্ভীর প্রেরণা ; একই সঙ্গে চাই বীচিবিক্ষোভে উত্তাল কোলাহলের মধ্যে অবগাহন করার স্থৈর্য। এই দুইকে নিয়ে আমাদের শিক্ষা হোক পূর্ণতার ইঙ্গিতবাহী।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. গৌরী ধর্মপাল : বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ

২. বিনয় ঘোষ : মেট্রোপলিটন মন ও মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ।